শান্তিময় ভবিষ্যৎ ও মুক্ত গণমাধ্যম

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

"Freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy."- Walter Cronkite. "Where the press is free… all is safe."- Thomas Jefferson. "Journalism is what we need to make democracy work."- Walter Lippmann. এরকম অনেক উক্তি আছে, যেগুলো একসঙ্গে আমাদের একটি গভীর সত্যের দিকে নিয়ে যায়। তা হল, স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং শান্তি সুদূর পরাহত।

আজকের পৃথিবী এক বহুমুখী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে দীর্ঘস্থায়ী ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে অপতথ্য বা ভুয়া তথ্যের বিস্তার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে জনমতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা প্রকটভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-এর ২০২৪ সালের সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত হচ্ছে। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, নজরদারি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার সমাজে বিভাজন বাড়াচ্ছে এবং শান্তি প্রক্রিয়াকে দুর্বল করছে। যখন কোনো রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয়, তখন সেখানে প্রথম বলি হয় শান্তি।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে "Shaping a Future at Peace: promoting freedom of press for human rights, development and security" প্রতিপাদ্য নিয়ে জাম্বিয়ার লুসাকায় অনুষ্ঠেয় বৈশ্বিক সম্মেলনে সাংবাদিক, প্রযুক্তিবিদ, মানবাধিকার কর্মী এবং নীতিনির্ধারকেরা একত্রিত হবেন। এ উদ্যোগই প্রমাণ করে সাংবাদিকতা, প্রযুক্তি, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং নিরাপত্তার মধ্যে সম্পর্ক কতটা গভীরভাবে আন্তঃনির্ভরশীল।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে কোনো গণমাধ্যম রাষ্ট্র, সরকার বা রাজনৈতিক প্রভাব, এমনকি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করতে পারে। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(১) ও ৩৯(২) ধারা এই অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মুক্ত গণমাধ্যম শান্তি প্রতিষ্ঠায় বহুমাত্রিক ভূমিকা রাখে। এটি যাচাইকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে গুজব ও উত্তেজনা প্রশমিত করে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ভিন্নমতের সহাবস্থানের জন্য সংলাপের মঞ্চ তৈরি করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সংক্ষেপে, মুক্ত সংবাদমাধ্যম একটি কার্যকর ওয়াচডগ, নাগরিক মঞ্চ এবং এজেন্ডা-নির্ধারক হিসেবে গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানব উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়। গণমাধ্যম সমাজের আয়না- যেখানে ন্যায়-অন্যায়, নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারের প্রতিফলন ঘটে। পাশাপাশি এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর হয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণেও জোরালো ভূমিকা রাখে।

২০১৪ সালের ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামে বালি রোড ম্যাপ গৃহীত হয়, যা ছিল ইউনেস্কোর নেতৃত্বে ৩০টিরও বেশি দেশের ২০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারীর সম্মিলিত অঙ্গীকারের দলিল। এই রোড ম্যাপে সরকার, সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া পেশাজীবী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে মর্যাদা দিতে সরকারগুলোকে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়। ফৌজদারি মানহানি আইনসহ সংবাদমাধ্যমের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ পুনর্বিবেচনা করতে, কারাবন্দি সাংবাদিকদের বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে পর্যালোচনা করতে এবং সাংবাদিকরা যেন ভয় বা আক্রমণের ঝুঁকি ছাড়াই কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। মূলত, ২০১৫-পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) মিডিয়ার স্বাধীনতা ও উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিকে বৈশ্বিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বালি রোড ম্যাপের মূল উদ্দেশ্য।

যারা নাগরিক সমাজের কথা শুনতে অস্বীকার করে এবং যারা এমন আচরণ করে যেন গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উন্নয়নের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়, ইউনেস্কোর এই অঙ্গীকার তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা। কারণ এই পারস্পরিক সম্পর্কের কথাটি এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে এখন আর সহজ নয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় তার সরকারের দৃঢ় অবস্থানের কথা বারবার পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং সম্প্রতি নোয়াব নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে গণমাধ্যমের উন্নয়নের জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নীতি সুস্পষ্ট- সরকার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না, বরং এর পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

এর আগেও সবসময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তিনি সোচ্চার ছিলেন। গত বছর তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সংবাদপত্রের কালো দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে ১৯৭৫ সালের ১৬ জুনের কথা স্মরণ করে তিনি গণতন্ত্রের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যম এখানে দুর্নীতি উন্মোচন ও মানবাধিকার রক্ষায় ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারপরও একথা একদম উড়িয়ে দেওয়া যাবে না যে, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনি চাপ, অনলাইন হয়রানি এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে এখনও বড়ো বাধা। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব একটি বড়ো বাধা, যেখানে করপোরেট স্বার্থ ও বিজ্ঞাপনের চাপ অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করে এবং আপস করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল লিটারেসির ঘাটতি বর্তমান সময়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া তথ্যের ভিড়ে মূলধারার গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। তৃতীয়ত, পেশাগত সুরক্ষার অভাব বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য একটি বড়ো উদ্বেগ, যেখানে ভীতিমুক্ত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই কেবল গণমাধ্যমের অস্তিত্ব নয়, একে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করাও সমান জরুরি।

তবে একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-এর ২০২৫ সালের বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ১৪৯তম স্থানে উঠে এসেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ১৬ ধাপ এগিয়ে। এ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত (১৫১) এবং ভুটান (১৫২)-এর চেয়ে ভালো অবস্থানেই রয়েছে। এই ধারাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এবং প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।

সরকার গণমাধ্যমের বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছে এবং এসব বৈঠক থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে বলে তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টিকারী বিতর্কিত আইনগুলো পর্যালোচনা ও সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি নতুন 'সুরক্ষা অধ্যাদেশ' প্রণয়ন, অপতথ্য বা 'ফেক নিউজ' প্রতিরোধে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিয়মনীতির আওতায় আনা এবং রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বিটিভির ওপর জনগণের আস্থা ফেরাতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে নতুন ওয়েজবোর্ড গঠন এবং একটি স্বতন্ত্র 'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন' প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

গণমাধ্যমের সাথে জড়িতদেরও করণীয় আছে অনেক। পেশাদারিত্বের প্রতি সম্মান ধরে রাখা, সাংবাদিকতার নৈতিকতা অনুসরণ করার মতো বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ কারো জন্যই নাই। নিজেদের অবস্থান সংহত করতে প্রযুক্তিকে নিবিড়ভাবে সমন্বিত করার কৌশল গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, প্রযুক্তি ও আগামীর সাংবাদিকতা একে অপরের সঙ্গে ক্রমশ গভীরভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে, এবং আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠবে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোকে এখন থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা সাংবাদিকতায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে তথ্যের সত্যতা যাচাই বা ‘ফ্যাক্ট-চেকিং’-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া জরুরি, যাতে ভুয়া তথ্যের বিস্তার রোধ করা যায়। প্রযুক্তির ব্যবহার যেন সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করার হাতিয়ার না হয়ে বরং তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যম হয়—এই নীতিই আগামীর সাংবাদিকতার জন্য দিকনির্দেশক হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, একটি শান্তিময় ভবিষ্যৎ কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না; এটি গড়ে ওঠে সত্যনিষ্ঠ তথ্য, পারস্পরিক আস্থা এবং মুক্ত মতপ্রকাশের ওপর ভিত্তি করে। গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা যেমন গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে, তেমনি প্রকৃত গণতন্ত্র পারে গণমাধ্যমকে স্বাধীন রাখতে। স্বাধীন গণমাধ্যম তাই যেকোনো সরকারের সেরা বন্ধু এবং যেকোনো জাতির টেকসই অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার

পিআইডি ফিচার